আমার গোয়েন্দাগিরি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আমার গোয়েন্দাগিরি

রবিবারে রবিবারে প্রশান্তবাবুর বৈঠকখানায় বসত একটি তাস-দাবা-পাশার আসর। দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়ার পর সভ্যরা একে একে সেখানে গিয়ে দেখা দিতেন। তারপর খেলা চলত প্রায় বৈকাল পাঁচটা পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বসতুম আমিও। তাস বা পাশার দিকে মোটেই ঘেঁসতুম না, কিন্তু দাবার দিকে আমার ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। ওখানে জন-তিনেক পাকা দাবা খেলোয়াড় আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আমি করতুম শক্তি পরীক্ষা।

বলা বাহুল্য, খেলার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও চলত। বাজারে মাছের দর ও বক্তৃতা মঞ্চে চড়ে জহরলাল নেহরুর লম্পঝম্প, গড়ের মাঠের ফুটবল খেলা ও বিলাতি পার্লামেন্টে চার্চিলের বাক্যবন্দুকনিনাদ, বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেতা শিশির ভাদুড়ি ও পণ্ডিচারি আশ্রমের ঋষি অরবিন্দ—অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনও কিছুই বাদ থাকত না আমাদের উত্তপ্ত আলোচনার বাইরে।

সেদিন তখনও খেলা শুরু হয়নি, এমন সময়ে পুলিশ কোর্টের একটা মামলার কথা উঠল। সম্প্রতি একসঙ্গে তিনটে নরহত্যা হয়েছিল এবং ইনস্পেকটার সুন্দরবাবু কেসটা হাতে নিয়ে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করে আসামিকে আদালতে হাজির করেছেন।

একজন শুধোলেন, মানিকবাবু, এ মামলাতেও আপনাদের হাত আছে তো?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললুম, তার মানে?

—লোকে তো বলে, সুন্দরবাবুর সব মামলার পিছনে থাকেন আপনি আর আপনার বন্ধু জয়ন্তবাবু।

—লোকের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। অবশ্য কোনও কোনও মামলায় সুন্দরবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন বটে। পরে সেসব ক্ষেত্রে জয়ন্তই হয় আসল পরামর্শদাতা, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে হাজির থাকি মাত্র।

হঠাৎ পিছন থেকে জিজ্ঞাসা শুনলুম, জয়ন্তবাবুর সঙ্গে সঙ্গে এতদিন থেকে গোয়েন্দাগিরিতেও আপনার কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে তো?

ফিরে দেখি নরেন্দ্রবাবু-সুবিখ্যাত ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেন। বিলাত ফেরত। যেমন তার হাতযশ, তেমনি তার পশার। তার আয়ের পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। পাশের বাড়িতেই থাকেন। মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়বার জন্যে এই আসরে উঁকিঝুঁকি মারতে আসেন।

নরেনবাবু আবার শুধোলেন, জয়ন্তবাবুর পার্শ্বচর হয়ে গোয়েন্দাগিরিতে আপনারও কিঞ্চিৎ বুৎপত্তি জন্মেছে তো?

আমি হেসে বললুম, হাঁ নরেনবাবু, জয়ন্তের সঙ্গে আমার তুলনা চলে না বটে, কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে সাধারণ লোকের চেয়ে আমি কিছু বেশি জ্ঞান অর্জন করেছি বই কি।

নরেনবাবু একখানা কাষ্ঠাসনের উপরে নিজের অঙ্গভার ন্যস্ত করে বললেন, তাহলে ছোট্ট একটি মামলার কথা শুনবেন?

আমি বললুম, আমার বন্ধু জয়ন্তের মতে গোয়েন্দাগিরিতে ছোটো বা বড়ো মামলা বলে কোনও কথা নেই। একমাত্র দ্রষ্টব্য হচ্ছে, মামলাটা চিত্তাকর্ষক কি না? এই দেখুন না, পুলিশকোর্টের যে মামলা নিয়ে আজ গোয়েন্দাগিরির কথা উঠেছে, একদিক দিয়ে সেটা বড়ো যে-সে মামলা নয়। একসঙ্গে তিন-তিনটে খুন! কিন্তু অপরাধী ঘটনাক্ষেত্রে এত সূত্র রেখে গিয়েছিল যে ধরা পড়েছে অতি সহজে। আসলে একেই বলে ছোটো মামলা। কারণ এটা চিত্তাকর্ষক নয়, এর মধ্যে মস্তিষ্কের খেলাও নেই। আবার এমন সব মামলাও আছে, যেখানে অপরাধ হয়তো তুচ্ছ, অথচ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার মতো সূত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এমন সব মামলাতে সফল হলেই গোয়েন্দার প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

নরেনবাবু বললেন, আমি যদি ওই রকম কোনও মামলারই ভার আপনার হাতে দিতে চাই, আপনি গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি?

বললুম, আমার আপত্তি নেই। মনে মনে ভাবলুম, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।, জয়ন্তের কোনও সাহায্য না নিয়েই নিজের বুদ্ধির জোরে মামলাটার কিনারা করতে পারি কি না!

ঘরের অন্যান্য লোকেরা প্রশ্ন করতে লাগলেন, কীসের মামলা ডাক্তারবাবু? খুনের চুরির, না আর কিছুর?

নরেনবাবু বললেন, এখন আমি কোনও কথাই ভাঙব না, আসুন মানিকবাবু, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন।

।। দুই ।।

নরেনবাবুর বাড়ি। একখানা মাঝারি আকারের ঘর। একদিকে দেওয়াল ঘেঁসে একখানা গদি মোড়া বড়ো চেয়ার, তার সামনে একটি টেবিল। টেবিলের উপরে দোয়াতদানে লাল ও কালো কালির দোয়াত। কলমদানে দুটি কলম। ব্লটিংয়ের প্যাড—তার উপরে খানিকটা অংশ লাল কালি মাখা। একটি টেলিফোন যন্ত্র। টেবিলের তিন পাশে খানকয়েক কাঠের চেয়ার। ঘরের দেওয়ালে একখানা অ্যালম্যানাক ছাড়া আর কোনও ছবি নেই। মেঝে মার্বেল পাথরের। কোনওরকম বাহুল্য বর্জিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর।

এইসব লক্ষ করছি, নরেনবাবু বললেন, এই ঘরে বসে প্রত্যহ সকালে আর সন্ধ্যায় আমি রোগীদের সঙ্গে দেখা করি। পরশু সন্ধ্যায় এইখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে।

—কী রকম ঘটনা?

-মোহনতোষবাবুর এক বন্ধুর নাম বিনোদবাবু। বিনোদলাল চ্যাটার্জি। ভদ্রলোক কন্যাদায়ে পড়েছিলেন। মোহনতোষবাবুর বিশেষ অনুরোধ তাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলুন।

-মোহনতোষবাবু কে?

–তিনি আমার প্রতিবেশীও বটে, রোগীও বটে। কিন্তু তার একটা বড়ো পরিচয় আছে। আপনি কি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের বিখ্যাত অভিনেতা মোহনতোষ চৌধুরির নাম শোনেননি?

-কারুর কারুর মুখে শুনেছি বটে।

–তার কথাই বলছি।

-তারপর?

–পরশু সন্ধ্যার সময়ে আমি এই ঘরে বসে আছি, এমন সময়ে বিনোদবাবু এসে তার ঋণ পরিশোধ করে গেলেন। পাঁচখানি হাজার টাকার নোট। (তখনও বাজারে হাজার টাকার নোট অপ্রচলিত হয়নি।) ঠিক তারই মিনিট পাঁচেক পরে ফোনে একটা অত্যন্ত জরুরি ডাক এল। বসন্তপুরের মহারাজা বাহাদুর ব্লাডপ্রেসারের দরুন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, আমাকে সেই মুহূর্তেই যেতে হবে। তখনই যাত্রা করলুম। তাড়াতাড়িতে যাবার সময়ে নোট পাঁচখানা ব্লটিংয়ের প্যাডের তলায় ঢুকিয়ে রেখে গেলুম। রাজবাড়ি থেকে যখন ফিরে এলুম রাত তখন সাড়ে নটা। এসে এই ঘরে ঢুকে দেখি, প্যাডের উপর লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে রয়েছে আর প্যাডের তলা থেকে অদৃশ্য হয়েছে হাজার টাকার নোট পাঁচখানা।

আমি বললুম, নিশ্চয় প্যাডের তলা থেকে যখন নোটগুলি টেনে নিচ্ছিল, সেই সময়ে দৈবগতিকে তার হাত লেগে লাল কালির দোয়াতটা উলটে পড়ে গিয়েছিল।

–খুব সম্ভব তাই।

–কারুর উপরে আপনার সন্দেহ হয়?

–বিশেষ কারুর উপর নয়। পুলিশকে খবর দিয়েছেন?

–না।

–কেন?

–কেলেঙ্কারির ভয়ে। আমি বেশ জানি পুলিশ এসে আমার বাড়ির লোকদেরই টানাটানি করবে। আমার পক্ষে সেটা অসহনীয়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ির কোনও লোকের দ্বারা এ কাজ হয়নি–হতে পারে না। অন্দরমহলে থাকেন আমার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, আমার দুই বালিকা কন্যা আর শিশুপুত্র। তাদের কারুরই এ ঘরে আসবার কথা নয়। বাড়ির প্রত্যেক দাসদাসী পুরাতন আর বিশ্বস্ত। নোটগুলো যখন প্যাডের তলায় রাখি, তখন তাদের কেউ যে এ অঞ্চলে ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। সুতরাং তাদের কেউ প্যাড তুলে দেখতে যাবে কেন?

–বাইরের কোনও জায়গা থেকে কেউ কি আপনার কার্যকলাপের উপরে দৃষ্টি রাখতে পারে না?

–মানিকবাবু, পরশু দিন সন্ধ্যার আগেই এই দুর্দান্ত শীতেও হঠাৎ বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে কি? দেখুন, এই ঘরের উত্তর দিকে আছে চারটে জানলা আর পূর্ব দিকে আছে দুটো জানলা আর দুটো দরজা। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক একেবারে বন্ধ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে উত্তরের জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে এই দরজা দেখা যায় বটে, কিন্তু বৃষ্টির ছাট আসছিল বলে উত্তর দিকের সব জানলাই বন্ধ ছিল। খোলা ছিল খালি পূর্ব দিকের জানলা-দরজা। ওদিকে আছে আমার বাড়ির উঠান, তারপর বারো ফুট উঁচু পাঁচিল, তারপর মোহনতোষবাবুর বাড়ি। আমার বাড়ির উঠানে আলো জ্বলছিল, আমি সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পাইনি। বৃষ্টি আর শীতের জন্যে মোহনতোষবাবুর বাড়ির

জানলাগুলো নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল, নইলে ও বাড়ির ঘরের আলোগুলো আমার চোখে পড়ত। সেদিন আমি কী করছি না করছি, কেউ তা দেখতে পায়নি।

—আপনি রাজবাড়িতে গেলে পর সেদিন অন্য কোনও রোগীর বাড়ি থেকে আর কেউ কি আপনাকে ডাকতে আসেনি?

–এসেছিল বই কি! হরিচরণের মুখে শুনেছি, পাঁচজন এসেছিল।

—হরিচরণ কে?

—সে বালক বয়স থেকেই এ বাড়িতে কাজ করে, এমন বিশ্বাসী আর সৎলোক আমি জীবনে আর দেখিনি। আমার সমস্ত আলমারি দেরাজ বাক্সের চাবি থাকে তার হাতে, আমার সমস্ত টাকা সেই-ই ব্যাংকে জমা দিয়ে আসে, তাকে না হলে আমার চলে না। আমার অবর্তমানে সেই-ই বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়।

—হরিচরণ কী বলে?

–সেদিন পাঁচজন লোক আমাকে ডাকতে এসেছিল। তাদের মধ্যে তিনজন লোক আমি নেই শুনেই চলে যায়, একজন লোক ঠিকানা রেখে আমাকে কল দিয়ে যায়, কেবল একজন লোক বলে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। হরিচরণ তখন তাকে এই ঘরে এনে বসিয়ে নিজের অন্য কাজে চলে যায়। কিন্তু মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে লোকটিকে সে আর দেখতে পায়নি। তবে এ জন্যে তার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। কারণ এখানে কোনও মূল্যবান জিনিসই থাকে না, আর বাইরের লোকের আনাগোনার জন্যে এ ঘরটা সর্বদাই খোলা পড়ে থাকে। হরিচরণের বিশ্বাস, আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে লোকটি আর অপেক্ষা না করে চলে গিয়েছিল।

—সে নাম-ধাম কিছু রেখে যায়নি?

–না।

—তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন?

-পেয়েছি। তার দোহারা চেহারা, শ্যাম বর্ণ, দেহ দীর্ঘ। শীতের জন্যে সে মাথা থেকে প্রায় সমস্ত দেহটাই ঢেকে আলোয়ান জড়িয়ে রেখেছিল, দেখা যাচ্ছিল কেবল তার মুখখানা। তার চোখে ছিল কালো চশমা, মুখে ছিল কাঁচা-পাকা গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম হবে না।

-লোকটির চেহারার বর্ণনা কিছু অসাধারণ। আপনার কি তারই উপর সন্দেহ হয়?

-মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয় যে, কোনও একজন বাইরের লোক আমার ঘরে এসে হঠাৎ টেবিলের প্যাডখানা তুলে দেখতে যাবে কেন? এ-রকম কৌতূহল অস্বাভাবিক নয় কি?

আমি নিরুত্তর হয়ে চিন্তা করতে লাগলুম। জয়ন্ত বলে, কোনও নূতন মামলা হাতে পেলে গোয়েন্দার প্রধান আর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সকলকেই সন্দেহ করা। কিন্তু খানিকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর আমার সন্দেহ ঘনিভূত হয়ে উঠল, দুইজন লোকের উপরে। কে ওই আলোয়ান মুড়ি দেওয়া কালো চশমাপরা, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িওয়ালা রহস্যময় আগন্তুক? নরেনবাবুর প্রস্থানের পরেই ঘটনা ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব এবং কেমন করেই বা জানতে পারলে, প্যাডের তলায় আছে পাঁচ হাজার টাকার নোট? তার মূর্তি, তার প্রবেশ ও প্রস্থান, তার কার্যকলাপ সমস্তই এমন অদ্ভুত যে যুক্তি প্রয়োগ করেও কিছু ধরবার বা বোঝবার উপায় নাই।

শেষটা আমি সাব্যস্ত করলুম, এতটা যুক্তিহীনতা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ওই মূর্তির কোনও অস্তিত্বই নেই, ও কাল্পনিক মূর্তি, ঘটনাক্ষেত্রে তাকে টেনে আনা হয়েছে, অন্য কোনও ব্যক্তির স্বার্থের অনুরোধে।

সেই ব্যক্তি কে? নিশ্চয়ই হরিচরণ! তার সাধুতা আর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নরেনবাবুর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সার্টিফিকেট মূল্যহীন, সাধুতার আবরণে সর্বদাই নিজেদের ঢেকে

রাখে বলেই অসাধুরা আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারে। আবার মানুষের মন এমন আশ্চর্য বস্তু যে, সত্যিকার সাধুও সময়ে সময়ে হঠাৎ অসাধু হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, হরিচরণ, ওই হরিচরণ! কালো চশমাপরা মূর্তিটার সৃষ্টি হয়েছে তারই উর্বর মস্তিষ্কের মধ্যে। নিজে নিরাপদ হবে বলে হরিচরণই ওই রহস্যময় কাল্পনিক মূর্তিটাকে টেনে এনেছে ঘটনাক্ষেত্রে। অতএব–

অতএব হরিচরণকে ডেকে এনে খানিক নাড়াচাড়া করলেই পাওয়া যাবে মামলার মূল সূত্র।

।। তিন ।।

ঠিক এই সময়েই ঘরের বাইরে ডাক শুনলুম—মানিক, অ মানিক! তুমি এখানে আছ নাকি?

এ জয়ন্তের কণ্ঠস্বর! তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, উঠানের রোয়াকের উপরে হাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত।

—ব্যাপার কী! তুমি কোত্থেকে

—তোমার রবিবাসরীয় আড্ডায় গিয়েছিলুম তোমাকে অন্বেষণ করতে কিন্তু সেখানে গিয়ে খবর পেলুম তোমার আজকের আসর এইখানে।

নরেনবাবুর সঙ্গে জয়ন্তের পরিচয় করিয়ে দিলুম। তিনি তাকে সাদরে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন।

জয়ন্ত শুধোলে, ডাক্তারবাবু, আপনি হঠাৎ আমার মানিক অপহরণ করেছেন কেন?

–আজ্ঞে, মানিকবাবুর হাতে আমি একটা মামলার ভার অর্পণ করেছি।

—বটে, বটে, বটে! মানিকও তাহলে আজকাল স্বাধীনভাবে গোয়েন্দার ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়! বেশ, বেশ উন্নতিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

আমি একটু লজ্জিত ভাবে বললুম, না ভাই জয়ন্ত, আমি তোমার উপযুক্ত শিষ্য হতে পেরেছি কি না, সেইটেই আমি আজ পরীক্ষা করতে এসেছি।

—দেখছেন ডাক্তারবাবু, বন্ধুবর মানিকের বিনয়েরও অভাব নেই। এ হচ্ছে আসল গুণীর লক্ষণ! তারপর মানিক, মামলাটার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ তো?

—মনে হচ্ছে পেরেছি। মামলাটার কথা তুমি শুনতে চাও?

—আপত্তি নেই।

তারপর দুই চক্ষু মুদে জয়ন্ত আমার মুখে মামলাটার আদ্যপান্ত শ্রবণ করলে। সেই কালো চশমাধারী মূর্তি ও হরিচরণ সম্বন্ধে আমার মতামতও তাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখতে ভুললুম না।

জয়ন্ত চোখ খুলে উঠে দাঁড়িয়ে, তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে ডাক্তারবাবুর নিজস্ব চেয়ারের উপর বসে পড়ল। তারপর পূর্ব দিকের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিষ্পলকনেত্রে। তারপর মুখ নামিয়ে টেবিলের প্যাডের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তারপর মৃদু হেসে চুপ করে বসে রইল প্রায় সাত-আট মিনিট ধরে। তার মুখ। সম্পূর্ণ ভাবহীন; কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম, তার মন এখন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারবাবু, ঘটনার দিন যখন আপনি বাইরে যান, তখন এই টেবিলের প্যাডের উপরে আর কোনও কাগজপত্র ছিল?

–না।

–তোমার বিশ্বাস ভুল।

–কী করে জানলে?

—ওই দ্যাখো প্যাডের পরে ছড়ানো লাল কালির মাঝখানে রয়েছে একটা চতুষ্কোণ (কিন্তু সমচতুষ্কোণ নয়) সাদা জায়গা। এ জায়গায় কালি লাগেনি কেন?

—ওখানে বোধহয় কোনও কাগজপত্র ছিল। কালির ধারা তার উপর দিয়েই বয়ে গেছে।

–এতক্ষণে তোমার বুদ্ধি কিঞ্চিৎ খুলেছে দেখে সুখী হলুম।

নরেনবাবু বলে উঠলেন, না মশাই, সেদিন ওই প্যাডের উপরে নিশ্চয়ই কোনও কাগজপত্র ছিল না।

জয়ন্ত সায় দিয়ে বলল, আপনিও ঠিক কথাই বলেছেন ডাক্তারবাবু। তবু এই সাদা অংশটার সৃষ্টি হল কেন, শুনুন। চোর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রথম প্যাডের তলা থেকে নোটগুলো বার করে নেয়। তারপর সেগুলো প্যাডের উপরেই রেখে গুনে দেখে। ঠিক সেই সময়েই তার গায়ের আলোয়ান বা অন্য কিছু লেগে লাল কালির দোয়াতটা হঠাৎ উলটে যায়।

আমি চমৎকৃত হয়ে বললুম, তা হলে লাল কালি পড়েছিল সেই নোটগুলোর উপর? জয়ন্ত আমার কথার জবাব না দিয়ে বললে, ডাক্তারবাবু, নোটগুলোর নম্বর নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই?

–না মশাই, নম্বর টুকে নেবার সময় পাইনি। তবে বিনোদবাবুর কাছে খবর নিলে নম্বরগুলো পাওয়া যেতে পারে।

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজকে এখনই খবর দিন। নম্বরগুলো পেলেই আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। এখন আমি বিদায় নিলুম, হয় কাল সন্ধ্যার সময়ে নয় দুইএক দিন পরেই আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব—এটা চিত্তাকর্ষক হলেও সহজ মামলা। চলো মানিক। নমস্কার ডাক্তারবাবু!

রাস্তায় এসে জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলুম, কে চোর সে বিষয়ে তুমি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছ।

জয়ন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললে, আমি এইটুকুই আন্দাজ করতে পেরেছি যে তুমি হচ্ছ একটি গাড়ল, একটি গর্দভ, একটি ইগ্নোমেরাস।

আমি একেবারে দমে গেলুম।

।। চার ।।

সোমবারের সন্ধ্যা। জয়ন্তের পিছনে গুটি গুটি যাত্রা করলুম নরেনবাবুর বাড়ির দিকে। দেখছি কাল বৈকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এবং আজ সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত সে বাড়ির বাইরেই কাটিয়ে দিয়েছে। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি ছোটোখাটো ইঙ্গিত পর্যন্ত আমাকে দেয়নি। আজও তার মুখ এমন গম্ভীর যে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা হল না।

নরেনবাবু বসেছিলেন আমাদেরই অপেক্ষায়। সাগ্রহে শুধোলেন, কিছু খবরাখবর পেলেন নাকি!

পকেট থেকে একখানা খাম বার করে জয়ন্ত বললে, এই নিন।

খামের ভিতর থেকে বেরুল পাঁচখানা নোট—প্রত্যেকখানা হাজার টাকার!

জয়ন্ত বললে, দেখছেন ডাক্তারবাবু! সব নোটের উপরেই কিছু না কিছু লাল কালির দাগ আছে! একখানা নোটে একদিকের প্রায় সবটাই লাল কালিমাখা—একখানা ছিল সব উপরে।

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে নরেনবাবু প্রায় আধ মিনিট নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, নোটগুলোর উপরে লাল কালির দাগ এতটা ফিকে কেন?

—চোর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল।

—কিন্তু চোর কে?

জয়ন্ত বললে, ক্ষমা করবেন, চোরের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তার নাম প্রকাশ করব না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, সে আপনার বাড়ির লোক নয়। ভবিষ্যতে সৎ পথে থাকার জন্যে আমি তাকে সুযোগ দিতে চাই, কারণ এটা হচ্ছে তার প্রথম অপরাধ। আজ আমরা আসি, নমস্কার!

।। পাঁচ ।।

বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, ভাই জয়ন্ত আমার কাছেও কি তুমি চোরের নাম প্রকাশ করবে না।

জয়ন্ত হেসে বললে, নিশ্চয়ই করব। চোরের নাম মোহনতোষ চৌধুরি।

সবিস্ময়ে বললুম, তাকে তুমি কেমন করে সন্দেহ করলে?

-কেবল পূর্ব দিকের দরজা-জানলা দিয়েই সেদিন নরেনবাবুর ঘরের ভিতরটা দেখবার সুযোগ ছিল। আর নরেনবাবুর চেয়ারে বসে পূর্ব দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলুম কেবল মোহনতোষের বাড়ির দোতলার ঘর। এই হল আমার প্রথম সন্দেহ। তারপর সেই কালো চশমাপরা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটার কথা ভাবতে লাগলুম। সে শীতের ওজরে আবার মাথা থেকে প্রায় সর্বাঙ্গে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে এসেছিল। কালো চশমা, সর্বাঙ্গে আবরণ—এ সব যেন আত্মগোপনের চেষ্টা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িও সন্দেহজনক। লোকটা হয়তো ছদ্মবেশের সাহায্য নিয়েছিল। কেন? পাছে হরিচরণ তাকে চিনে ফেলে,

সে নিশ্চয়ই পরিচিত ব্যক্তি। তার আকস্মিক প্রস্থানও অল্প সন্দেহজনক নয়। আগেই শুনেছি, মোহনতোষ একজন অভিনেতা, তার ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ আছে। এই হল আমার দ্বিতীয় সন্দেহ। তার বন্ধু বিনোদ যে ঘটনার দিনেই সন্ধ্যাবেলায় নরেনবাবুর টাকা শোধ দিতে যাবে, এটাও নিশ্চয়ই সে জানতে পেরেছিল। আমার তৃতীয় সন্দেহ। তারপর আমি এখানেওখানে ঘুরে যেসব তথ্য সংগ্রহ করলুম তা হচ্ছে এই মোহনতোষ বিবাহ করেনি, বাড়িতে একাই থাকে। বাড়ির একতলা সে ভাড়া দিয়েছে। তার আরও একখানা ভাড়া বাড়ি আছে। এইসব থেকে তার মাসিক আয় প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা। ওই আয়ে তার মতো একক লোকের দিন অনায়াসে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার চলত না। কারণ সে ছিল বিষম জুয়াড়ি। বাজারে তার কয়েক হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও টাকা ধার করতে ছাড়েনি। এই ঋণ কতক শোধ করতে না পারলে শীঘ্রই তাকে আদালতে আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানিক, সব কথা আর সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ইনস্পেকটার সুন্দরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আজ আমি মোহনতোষের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। এই তার প্রথম অপরাধ। আমাকে দেখেই ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর আমি তখন কীভাবে সে কার্য সিদ্ধি করেছে তার একটা প্রায় সঠিক বর্ণনা দিলুম আর জানালুম যে নোটের নম্বর আমরা পেয়েছি, এখন এই কালিমাখা নোটগুলো ভাঙাতে গেলেই বিপদ অনিবার্য, তখন সে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

তার নিজের মুখেই শুনলুম, কোনওরকম চুরি করবার ইচ্ছাই তার ছিল না, জীবনে। কখনও চুরি-চামারি করেওনি। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে তার অত্যন্ত মাথা ধরেছিল, ঘরের আলো নিবিয়ে সে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকেই সে দেখতে পায় তার বন্ধু বিনোদ এসে নোটগুলো দিয়ে গেল নরেনবাবুকে আর তিনিও হঠাৎ, ফোনে ডাক পেয়ে সেগুলো প্যাডের তলায় খুঁজে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় গজিয়ে উঠল সস্তায় কিস্তি মাত করবার দুবুদ্ধি। কিন্তু মানিক, তার প্রথম অপরাধ আমরা ক্ষমা করেছি।

—আর সেই সঙ্গে তুমি ব্যর্থ করে দিলে আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি। দুঃখিত ভাবে আমি বললুম।